ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সূচনা পর্ব ঃ বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ওঠাপড়া বিশ্বের দুই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শিথিলতা ও উষ্ণতায় বৈপরীত্যে পূর্ণ এবং এই সম্পর্কের গ্রাফ্ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ ও উভয়ের জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে এত পরিবর্তিত হয়েছে যে এ বিষয়ের গবেষকগণই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।[১] প্রথম দশক অর্থাৎ ১৯৪৭-১৯৫৭ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতি ভারতের প্রতি ছিল ব্রিটিশ সরকার দ্বারা প্রদেয় ধারণা ও পরামর্শ অনুযায়ী চালিত।[২] ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে দূরত্ব ছিল তার জন্য ঠান্ডাযুদ্ধ বা ভারতের উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন—এই দুই বিষয়ের কোনোটাই দায়ী ছিল না। বরং দেশীয় স্বাধীন রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর-এর বিভাজন নিয়ে সমাধানহীন সমস্যা ছিল। সেটিই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তিক্ততর করার পিছনে অনেকটাই দায়ী ছিল।[৩] কাশ্মীর ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অযৌক্তিকভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা অপেক্ষা পাকিস্তানের হয়ে বিষয়টি দেখেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাশ্মীর ইস্যু ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। পারমাণবিক শক্তির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কীরূপ হবে, প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের প্রতি

Scanned with CamScanner

মার্কিন নীতি, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইন্দো-চিন ইস্যু, কোরিয়া সংকট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক অনুশীলন ভারতকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। কতকগুলো বিষয়ে ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। এগুলো হল—

(১) জোটনিরপেক্ষতার নীতি ভারত গ্রহণ করেছিল ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। ভারত জোটনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। ভারতের এই দ্বিচারিতা ওয়াশিংটন ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি।

(২) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। চিনের স্বাধীনতার পর (১৯৪৯) ভারত দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গণ-প্রজাতান্ত্রিক চিনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হয়েছিল।

(৩) ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে সামরিক সহযোগিতা স্থাপন করতে চেয়েছিল এবং ওয়াশিংটন চেয়েছিল নতুন দিল্লি যাতে তার সামরিক জোটে যোগদান করে। কিন্তু ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনো সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে যেতে চায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করেছিল। ভারত NATO, (১৯৪৯), SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক জোটের সদস্য হয়নি।[৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ ছিল এটি।

(৪) ১৯৫৪ সালে স্বাক্ষরিত 'পাক-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ভারতের সাথে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি ভারত-পাক সম্পর্কে স্থায়ীভাবে তৃতীয় পক্ষরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অংশগ্রহণ শুরু হয় সেই সময় থেকেই।[৫] এই অযাচিত সম্পর্ক তিন দেশের ক্ষেত্রে জোরালো প্রভাব বিস্তার করেছে।

(৫) কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে (পূর্ব পাকিস্তান) মার্কিন সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল পাকিস্তানের প্রতি। পাকিস্তানের আহ্বানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, প্রত্যুত্তরে ভারতের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নও সমরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন নৌবহর নিয়ে হাজির হলে পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে পড়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা ওয়াশিংটন ও নতুন দিল্লির সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল।

Scanned with CamScanner

(৬) ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর চরম আগ্রাসন নীতিতে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছিল।

(৭) ভারত মহাসাগরে মার্কিন রণতরীর বিস্তৃত রণসজ্জা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের পর থেকেই। ক্ষমতা শূন্যতার সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরকে চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষমতা জাহির করার এলাকা রূপে ব্যবহার করতে থাকায় ভারত-মার্কিন মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল, যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

(৮) ১৯৬৭ সালে নাগা উগ্রপন্থী নেতা ফিজোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশ্রয় প্রদান করায় ভারত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

(৯) ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দশবছর ধরে চলতে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার ওপর প্রদত্ত অস্ত্র বিক্রি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় অস্ত্রের জোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তাই ভারত অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

(১০) তারাপুর পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের জ্বালানির জন্য আবেদন করেও নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনের কাছ থেকে সাড়া পায়নি। ঐ প্রকল্পটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করেছিল। মার্কিন চাপ সত্ত্বেও ভারত বৈষম্যজনিত কারণে NPT-তে স্বাক্ষর করেনি।

(১১) ঠান্ডাযুদ্ধের সময় মার্কিন বিদেশনীতি, ঋণদান নীতি তথা নয়া উপনিবেশবাদী নীতি ও আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে ভারত সরব হয়েছে বহুবার, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

যাইহোক, ঠান্ডাযুদ্ধের সময়কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একপেশে ও নেতিবাচক রূপে উপস্থাপিত করা হলে সঠিক বিচার হবে না। বরং বলা ভালো ইতিবাচক কিছু বিষয় ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী ছিল না। জওহরলাল নেহরুর আদর্শবাদী ও পরবর্তীতে পথভ্রান্ত বিদেশনীতি ওয়াশিংটন-নতুন দিল্লির সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছিল। উভয় দেশের সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অভাবের জন্য ভারতের দিক দিয়ে ভুল ছিল মূলত দুটি। **প্রথমত,** জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি (১৯৭১) স্থাপন। **দ্বিতীয়ত,** স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার খুবই দুর্বলতা ছিল, ছিল শিল্পে অনগ্রসরতা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। উপরন্তু এতে যুক্ত ছিল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক আদর্শগত কিছু ভাবনাচিন্তা, যার জন্য সামগ্রিকভাবে মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠতে পারেনি ভারত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির

Scanned with CamScanner

বিস্তার ও ভালো বাজারও সৃষ্টি হয়নি তখনকার ভারতে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক দিকও ছিল ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে, যেগুলো নীচে উল্লেখ করছি।

(১) গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভারতের সম্পর্ক প্রথম দিকে বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। ১৯৫১ সালে 'Technical Cooperation Agreement'-এর আওতায় ভারতকে মূল্যবান আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং শিক্ষাগত সাহায্য প্রদান করেছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে খাদ্যশস্য সাহায্য প্রদান করেছিল। ভারত বিভিন্ন বেসরকারি মার্কিন সংস্থার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়েছিল, যেমন ঃ ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, কার্নেগী ফাউন্ডেশন প্রভৃতি।

(২) দ্বিতীয় পর্বে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ। হেনরি কিসিংগার-এর মতে, 'ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলো বিষয়ে অভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে, যার মাধ্যমে দু'দেশ পারে যৌথভাবে মানব কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করতে।' নিক্সনের বিদায়ের পর ফোর্ড মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়ে ভারতের প্রতি এ বার্তা প্রদান করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আগ্রহী।

(৩) ১৯৭৭ সালে জনতা দল নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছিল। জিমি কার্টার পুনরায় ক্ষমতায় এলে ভারত-মার্কিন যৌথ কমিশন ও উপকমিশন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৮ সালে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সখ্যতা বাড়ানোর জন্য জিমি কার্টার ভারত সফর করেন এবং প্রত্যুত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান।

(৪) শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল। ১৯৮২ সালে শ্রীমতি গান্ধি পূর্ব নির্ধারিত মস্কো সফর বাতিল করে প্রথমে ওয়াশিংটন সফরে যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষা অধিক—এই বার্তা দেওয়ার জন্যই ভারতের পক্ষ থেকে এই কূট-কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ১৯৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। তিনিই প্রথম আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে উদার বাণিজ্য নীতি চালু করার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রযুক্তিগত সহায়তা চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল দু'দেশের মধ্যে। চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সহমত প্রকাশ করেছিল।

Scanned with CamScanner